Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 36 – 44
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

দেবেশ রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প : অনুভবের গাঢ়তা ও শৈলী-স্বাতন্ত্র্যের অনন্য আখ্যান

কিশোর কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক
দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ, পূর্ব বর্ধমান
ইমেইল : kishoreroy84@gmail.com

Keyword
Style, technique, middle-class, identity crisis socio-economic consciousness, globalization, modernity, moral value.

Abstract
Debesh Roy is a unique story-writter of Bengali literature. The predecessors, the successors, or the contemporary— he is diiferent from all. His childhood was spent in Jalpaiguri district of North Bengal. School and college life were also spent there. He was actively associated with the Communist Party of India from a very young age. Also he was associated with journalism. These actions of the early age had a great influence on his mind. He mentioned the importance of journalism in terms of accuracy in writing story or novels. He had acknowledged the knowledge of language, history, geography towards narrative literature. Due to the combined effect of all these, he got a unique style of telling story. Sharp intellect mind, thinking style, unbiased vision of a journalist and direct experience gathered from the real world had enriched his writngs. His first appearance in literature was mainly during India's independence. The burning wounds of partition, refugee problems, ethnic riots etc. were very evident during that time. Moreover, the recent World War-II, post-colonialism, etc. had created dire problems such as insecurity, lack of moral values, mistrust and spiritual crisis. The world war had stopped— but its impact was still strong. It is in this background that the story-writter Debesh Roy arrived. Partition, caste riots ravaged middle class crisis etc. therefore became the subject of his stories written during this period. Apart from these, he got a connection with the Rajbanshis, the Nepalis, the Madhesians in his early days. He mastered many things like their food habits, daily life, language etc. with sincerity. It is because of that hearty-connection, story of these' people came up in his writings in later life. How the land and people of the North Bengal are being changed in the gradual evolution due to the influence of globalization, the author has also highlighted. He also portrayed the unethicalness of the middle class people, the terrible women abuse and the recent child-rape and murder case of Unnao. Noteworthy, absence of traditional narrative, but individuality of speech, intensity of feeling, establishing facts, theory building - these are the soul of his stories. This style can be found in all of his stories from the beginning-era; from the sixties of the last century to the second decade of the twenty-first century. In this article, some of his early-written stories, such as 'Dupoor', 'Jaladhar Banerjeer Mrityu',

'Morter Paa'; stories written in 21st century- 'Maguimarir Mapjokher Adolbodol', 'Ghumer Vetor Highway', 'Ilar Dwitiyo Gorvo' etc. will be characterized by uniqueness.

Discussion

দেবেশ রায় বাংলা কথাসাহিত্য জগতে মননশীল, মেধাবী এক নাম। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কাব্যজগৎ যখন বয়ন-বাচন বিষয়ে এক নতুন লোকে পদার্পণ করছে, সেই সময় কথা সাহিত্যেও, বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে দেবেশ রায় প্রকরণ-আঙ্গিক ও বিষয়গত ক্ষেত্রে নব নব প্রতিস্পর্ধী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। নির্মাণ করেন তাঁর স্বতন্ত্র style. সে style পারিপার্শ্বিককে দেখবার ক্ষেত্রে। 'দেখা'কে আবার ভাবনায়, ভাবনাকে ভাষায়, ভাষাকে কাঠামো দেওয়া ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে। তাঁর সাহিত্যলোকে সন্তরণ করলে সহজেই তা বোঝা যায়। অথচ style ব্যাপারটাই প্রতিটি লেখকের স্বতন্ত্র! তবুও দেবেশ রায়কে আলাদা করে বিশিষ্ট করবার কারণ বিবিধ। যুবা বয়সে ডুয়ার্সের উত্তরের রাজবংশী-নেপালী-মদেশিয়া জনজীবনের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ, মার্ক্সিজম-কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়েও স্বতন্ত্র রাজনীতিতে আদর্শায়ন, অল্পবয়সে হাজতবাস, পত্রিকা সম্পাদনা (জনমত, ত্রিস্রোতা, পরে উত্তরবাংলা, উত্তরদেশ, পরিচয়, কালান্তর); সর্বোপরি লেখালেখি- তাঁর বিচরণ সর্বত্র। ফলে বাস্তব-পটভূমে ভাবনাকে যখন লেখনীতে ধারণ করতে গেলেন, দেখতে পেলেন জীবন ও সমাজের বিচিত্র চেহারা-পরিবেশ-পরিস্থিতি! বাস্তব জীবনে খেটে খাওয়া মাটির মানুষের জীবন সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে নাগরিক মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বমুখরতা ও দোলাচলতা। জীবনের সেই লড়াই-শঙ্কা-দ্বিধা-জটিলতা দেবেশের হাতে ব্যবচ্ছেদের পর তাত্ত্বিক রূপ পেল গল্পে-উপন্যাসে। তিনি বলেছেন-

> "…. ছোটগল্প নিয়ে আমার ভাবনার অভ্যেসটাকে বদলে ফেলতে চাইছিলাম, আয়ত্ত করতে চাইছিলাম একটা বড় কাহিনী, নানা রকম চরিত্র, নানা ধরণের সম্পর্ক, তথ্য তৈরি করে তোলা, তথ্য বিন্যস্ত করে ফেলা, বিস্তারের দিকে যাওয়ার বেগ, সংলাপের তৎপরতা।"[১]

তাঁর লেখা তাই সমসাময়িক মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, আনন্দ বাগচী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি সকলের থেকে হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। দেবেশ রায়ের গল্প-কাহিনী উপলব্ধিতে সহায়ক নিম্নোক্ত দু'টি উক্তি—

> ১। "স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প, উপন্যাস কাহিনীবৃত্ত প্রধান না হয়ে, হয়ে উঠেছে মননঋদ্ধ। নির্মম জটিল বাস্তব অনুভবের গাঢ়তায় নির্মিত তাঁর কাহিনী আখ্যান বৃত্তান্ত। সময়ের পরিবর্তন মানুষকে নিয়ত বদলে দিচ্ছে, বিশ্বায়ন এসে ঢুকে পড়ছে মধ্যবিত্ত, গ্রাম্য জীবনের হেঁসেল ঘরে, সেই বদলের চিত্র বর্ণিত হয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসের নতুন ফর্মে।"[২]
>
> ২। "প্রথম দিকের গল্পগুলিতে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের বিশ্বস্ত বিবরণ এবং সুখ দুঃখের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরলেও সেইসব গল্প ছিল প্রচলিত ছকের বাইরে। বিষয় এবং বিন্যাসেও অভিনব। আবার নামকরণের ব্যঞ্জনায়, সংলাপের সম্পূর্ণতায়, 'বানানের কত কৌশল, যতি চিহ্নের কত ব্যবহার, বাক্য গঠনে কত ভাঙন' ইত্যাদিতে গল্পগুলিকে তিনি অন্যরকম অবয়ব দান করেছেন। সমসাময়িক গল্পকারদের বাস্তবতার চিত্র থেকে তাঁর গল্পে বাস্তবতার মাত্রাও পৃথক।"[৩]

দেবেশ রায়ের গল্প অসংখ্য। সেগুলি কখনো মনস্তত্ত্বমূলক, কখনো সমাজতত্ত্ব নির্ভর, কখনো রাজনৈতিক পটভূমি নির্ভর, আবার অনেকগুলো আটপৌরে মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী। প্রত্যেকটিই নির্মাণ স্বাতন্ত্র্যে অভিনব। বর্তমান নিবন্ধে বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত দীর্ঘ কালিক পরিসীমায় লেখা কয়েকটি গল্প অবলম্বনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ও লেখনীর পর্যালোচনায় অগ্রসর হব।

'দুপুর' (দেশ/১৯৫৮) গল্পটি কেবলমাত্র দেবেশ রায়ের গল্প হিসেবেই বিশিষ্ট নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারেই অনন্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের মনস্তত্ত্বমূলক এই গল্পে প্রথাগত কোনও কাহিনী নেই। দিনের একটি বিশেষ প্রহর—দুপুরই যেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে অন্য চরিত্রগুলির নিয়ন্তা। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এর সমগোত্রীয় গল্প অমিল। উল্লেখ্য, লেখালেখির প্রারম্ভিক লগ্নে এই গল্পই দেবেশকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিল।

রবিবারের ছুটির দিনে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সকল সদস্যের একাকীত্ব-নির্ভর গূঢ় আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের অনুভূতি, হতাশা-যন্ত্রণা, অব্যক্ত কামনা দুপুরের পটভূমে মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা পেয়েছে। গল্পটি পাঠ করতে করতে কখনো কখনো একঘেয়েমির দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। কিন্তু দেবেশ রায়ের গল্পের বিশেষত্বই হল, তাঁর গল্পবিশ্ব পাঠকের কাছে প্রাক্-প্রস্তুতি মানসিক অনুশীলন দাবী করে। লেখকের মনোভূমি জেনে তাঁর রচনার জগতে পদার্পণ, রচনার তত্ত্ব ও সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে কাম্য। এই সূত্র ধরেই রসজ্ঞ উপভোক্তা ক্রমেই প্রাগুক্ত একঘেয়েমিকে অতিক্রম করে 'টসটসে' 'টইটম্বুর' দুপুরে আচ্ছন্ন হতে থাকেন। গল্পকার যুবতী সতীর অনুভূতিতে লিখেছেন-

> "দুপুর; টইটম্বুর, টসটস করছে দুপুরটা। মধ্যসমুদ্রের মতো নিস্তরঙ্গ, বিকট, ব্যাপক, রঙহীন; চুম্বক-পাহাড়ের মতো আকর্ষক, ফুলশয্যার পুরুষের মতো স্থির সবল-জ্বলন্ত।"[৪]

লেখক সতীর অনুভূতিকে আরও বাঙ্ময় করেছেন এই ভাবে-

> "সতী হিলহিলে, এই শরীরটা উত্তপ্ত, তৃষ্ণার্ত, কাতর। শরীরটা জ্বলছে। ...দুপুরের মিষ্টি বোটকা গন্ধ। দুপুরের খাওয়াতে চাওয়া। দুপুরের খেতে ভালো না-লাগা।"[৫]

অন্যদিকে পরিবারের কর্তা যতীনবাবু 'রঙ চেনেন, রঙ জানেন না'। তার কাছে "অনেক ছেলের মা, শিথিল দেহ, শ্লথ যৌবন নারীর মত দুপুরটা হাঁফসাচ্ছে। জিভ আর দু'পাশের দুটো ছুঁচল দাঁত বের করে দুপুরটা পরে আছে মাদি কুকুরের মত।"[৬] চল্লিশোত্তর রঙ না জানা যতীনবাবু তাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু কিছু দেখবার জন্য নয়। তিনি মনে করেন, 'আজকাল নানারকম জটিল রঙ হয়েছে,', তাই সেগুলো তিনি চেনেন না।

যতীনবাবুর স্ত্রী রেণুবালার অনুভবে—

> "ছোট্টখাটো ভুঁড়িআলা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকের মতো দুপুরটা ঘুমুচ্ছে।"[৭]

এই দুপুরেই 'বিশ বছরের মোটাসোটা মায়া' অফিস থেকে কারো ফেরার জন্য অপেক্ষমাণ। তার কাছে এই দুপুর অতল রহস্যময়। পরিবারের ছেলে মুকুলের কাছে—

> "কিশোরীর মত দুপুরটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে, ভরে উঠছে। খুব চেনা, অথচ রহস্যময়, সুন্দর। দূরে দাঁড়িয়ে। মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে দেখা কোনো দোতলা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়ের মতো—দূরের, তাই মনের কাছের, তাই সুন্দর।"[৮]

প্রত্যেকটি চরিত্র স্ব স্ব ভাবনার কেন্দ্রিকতায় একে অপরের থেকে ছিন্ন। দুপুরের পটভূমিকায় নেপথ্যের বেহালার ক্ষীণ, অস্পষ্ট একটি সুরের আবহে আপন-আপন অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তারা ভাবালু দ্যোতনা দিয়েছে। দেবেশ রায়ের এই গল্পপাঠ তাই একটি অনুভূতিশীল মনের দাবী রাখে। সেই অনুভবের সোপানে ভর করে গল্পটি ক্রমেই পাঠককে অসাধারণ রসে রোমাঞ্চিত করে। 'দুপুর' গল্পের চরিত্রগুলি রক্তসম্পর্ক ও পারিবারিক সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ—যা আপাত। তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বকে প্রকট করে দিয়েছে একটি ছুটির দুপুরে তাদের মনোলোকের অনুভূতি ও চেতনার পার্থক্য- যা তাদের অস্তিত্বের সংকটকেই ইঙ্গিতায়িত করে। এ কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য? যা যূথবদ্ধতার মধ্যেও স্ব স্ব চেতনার লাগামে ব্যক্তিকে একাকীত্বের ভয়ঙ্করতায় পীড়িত করে? গল্পকারের বৌদ্ধিক চেতনা পাঠককে ভাবনার গভীরতায় নিয়ে যায়। তবে এই বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের মধ্যেও চরিত্রগুলিকে ঐকতানে স্থাপিত করেছে নিদাঘ দুপুরে একটানা বেজে যাওয়া মাটির বেহালার একটা ক্ষীণ সুর। চরিত্রগুলি ভাবনার স্বকীয়তায় পরস্পর দূরবর্তী; অথচ বেহালার ক্ষীণ সুরেই ঐকসূত্রপ্রাপ্ত— ব্যঞ্জনায় সেই সুর তাই গভীর। যূথবদ্ধতা থেকে ছিন্ন চরিত্রগুলি পীড়িত হতে থাকে অস্তিত্বের সংকটের এক গভীর প্রশ্ন দ্বারা। তারপর একসময় গল্পের দুপুর শেষ— ব্যক্তি অস্তিত্ব থেকে চরিত্রগুলি ব্যাষ্টি অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়েছে অপরাহ্নগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে। অপরাহ্ন তখন প্রাহরিকতা অতিক্রম করে চরিত্রগুলির মানসিক অপরাহ্নগ্রস্ততার কথাই প্রতীকায়িত করেছে বেশি। দুপুর শেষে তাই পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকার মধ্য দিয়ে এক অনিবার্য সংকট অদ্ভুত ভঙ্গিতে গল্পে এভাবেই আভাসিত হয়েছে।

'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু'(পরিচয়/১৯৫৮) গল্পটি 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-১'-এর অন্তর্গত। গল্পের শিরোনামে মৃত্যুর কথা থাকলেও প্রকৃত বিচারে মৃত্যু এখানে উপেক্ষিত; উপেক্ষিত কারণ, মৃত্যুর কারুণ্য বা বিষাদময়তাকে গৌণ করে বরং একটি সত্তার যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ অতীত-চর্যাকে দেখাতেই মৃত্যু-প্রসঙ্গের উত্থাপন।

"জলধর ব্যানার্জি সেই জাতের লোক, 'বেঁচে ছিলাম' এ কথাটা ঘোষণা করার জন্য মরা ছাড়া যাদের আর কোনো পথই খোলা নেই।"[৯]

শোক বা বিষাদময়তার আবহ সৃষ্টি লেখকের অভীষ্ট নয়।

গল্পে সাতান্ন বছর বয়সী গতানুগতিক প্রাণহীন জীবন কাটানো জলধরবাবু মারা গিয়েছেন। সেই পটভূমিকায় তার অতীত জীবনচর্যা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি-

"গত পঁচিশ বছর ধরে জলধরবাবু যে এক ও অকৃত্রিম চেহারায় সকলের কাছে প্রত্যহ আবির্ভূত হয়ে নিজের অস্তিত্বটাকে মুছে এনেছিলেন ঠিক সেই চেহারায় তক্তপোষটার ওপর শায়িত দেহটা সবাইকে চমকে দিয়ে জানাল, এ্যাঁ, এ লোকটি বেঁচে ছিল এবং মরে গেল।"[১০]

লেখক জলধরবাবুর সপ্তাহে একদিন দাড়ি কমানো, তার ভাঙা সাইকেল-পুরোনো ঘড়ি, যার সময় দেবার জটিল হিসেব একমাত্র জলধরবাবুই বুঝতেন, বা তার স্ত্রীর বিকল সেলাইয়ের কল- সমস্ত কিছুকেই জলধরবাবুর যান্ত্রিক, বেরঙীন জীবনে প্রতীকায়িত করেছেন। তিনি বিবর্ণ, কিন্তু সেই বিবর্ণতার এমনই গাঢ়ত্ব যে পাড়ার অবিনাশবাবু মোহিনীবাবু, মাখনবাবু, সনাতনবাবু, সুকুমারবাবু বা গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কোনো অন্তর করা মুশকিল। তাই তার নিজ (অতীত) অস্তিত্বকে, বা 'বেঁচে ছিলাম' এটা প্রমাণ করতে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। একটা অসাড়(এবং অসার), নিস্তরঙ্গ নির্জীবের মত কাটানো জীবনকে, যার কাছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ধূসর, লেখক তাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতা-উত্তর মধ্যবিত্ত জীবন, তার গতানুগতিকতা, খেয়ে-পড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকার যে মানসিকতা, তাকে লেখক এই গল্পে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

'মর্তের পা' (১৯৬২) গল্পটি রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা-উদ্ভূত লেখা। সমাজের ধনলিপ্সু, উচ্চবিত্তদের শোষণ-পীড়নে নিম্নবিত্ত বা নিচুশ্রেণীর জাগরণ ও প্রতিরোধ-প্রতিবাদের কাহিনী এটি। পৌরাণিক পটভূমিকা ব্যবহারে লেখক গল্পটিকে আকর্ষণীয় করেছেন। অবহেলিত-নিষ্পেষিত সমাজের সাধারণ জনগণ একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে প্রতিবাদমুখর হবেই, এই কথাই এখানে বার্তায়িত।

সদানন্দময় স্বর্গের ছবি দিয়ে গল্পের শুরু। মর্তে জন্ম-মৃত্যুর 'ব্যালান্স' ঠিক রাখতে চিত্রগুপ্তের দেবদূত-যমদূতদের প্রেরণ; দায়িত্ব বন্টন শেষে স্বর্গে সক্কলের নিশ্চিন্ত নিদ্রার চিত্র রয়েছে। দেবদেবী সহ সকলেই যখন দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে নিরালায় বিশ্রামরত, সেই সময় অকস্মাৎ কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ছেয়ে গেলে স্বর্গের প্রহরী ভীত হয়ে বিপদসূচক 'পাগলাঘন্টি' বাজাতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনে,

"কোকিলের কুজন, মৃগের গাত্রকন্ডুয়ন, মৌমাছির গুঞ্জন ও দেবদেবীর যৌবনউদ্ভিন্ন হওয়ার শব্দের মাঝখানে সেই থালার আওয়াজ শুনে পঞ্চশরের মত নিরাপদ শরগুলিতেই যাঁরা দিনে একবার করে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন, তারা মৃত্যুমুখেই পতিত হতেন, কিন্তু তাঁদের বাপঠাকুর্দারা কেউ কেউ অমৃত খেয়েছিলেন বলে তাঁরা বেঁচে রইলেন।"[১১]

গল্পে শত শত নিরীহ প্রাণ হানির বিপরীতে এ যেন বড়লোক শ্রেণীর ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া।

অতঃপর শোষিত-পীড়িত জাতি, যাদের পেটে অসীম ক্ষুধা, অঙ্গ বস্ত্রহীন—উলঙ্গ বুভুক্ষু অবস্থায় চতুর্দিক আলোড়িত করে সুবিচারের প্রত্যাশায় স্বর্গরাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। তাদের হাতে ফেস্টুন- 'বিশ্ব গর্ভিনী সমিতি'। তারা কেউ পূর্ণ গর্ভবতী, কেউ আট মাস, কেউ নয় মাসের। সেখানে রয়েছে এক-দুই দিন থেকে শুরু করে এক-দুই মাসের পোয়াতি। কেউ প্রসব বেদনায় কাতর- অথচ গর্ভস্থ শিশুকে জন্ম দিতে গররাজি। বিষাক্ত পৃথিবীর দূষিত আবহাওয়ায় কেই বা চায় আপন সন্তানকে জন্ম দিতে!

"মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। খিড়কি দোরের সেই ওৎপাতা গুপ্তঘাতকের করদরাজ্যে জন্ম তাই প্রত্যাখ্যাত, কেউ বাঁচবে না, কেউ জন্ম নিতে চায়না।"[১২]

এসময় 'গর্ভিনী সমিতি'র পোয়াতিরা হঠাৎ আলোড়িত হয়ে ওঠে। তারা প্রসব বেদনায় কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, কেউ নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ছে। আর এদিকে তখনই যমদূতেরা রাশি রাশি মৃতদেহ নিয়ে সভায় প্রবেশ করে। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরের খ্রিস্টমাস নামক দ্বীপে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষার ফলে পৃথিবীতে হিসেবের বাইরে অনেক,

তেষট্টিগুণ বেশি মৃত্যু হয়েছে! একদিকে রাশি রাশি মৃতদেহ, অন্যদিকে পোয়াতিদের প্রতিবাদ- ক্রমেই সমোচ্চারিত হতে থাকে।

> "তারপর তাদের পেটের ভেতর থেকে একদিনের দু'দিনের তিনদিনের বীজ, একমাস দু'মাস তিনমাসের ভ্রূণ, চারমাস ছ'মাসের অগঠিত দেহ, আটমাস নমাস দশ মাসের পূর্ণদেহ গর্ভস্থ শিশুরা কচি অস্পষ্ট তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা জন্ম নেব না'"[১৩]

সেই চিৎকারে উৎসাহিত সমস্ত পোয়াতি একটিমাত্র চরিত্রে রূপ পায় এবং তাদের সম্মিলিত পদাঘাতে দেবতারা পাঠখড়ির পুতুলের মত ভেঙে পড়ে। পৌরাণিক পটভূমিতে লেখক এ গল্পে দেবতাদের রূপকে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যায়-অবিচারকে চিত্রিত করার পাশাপাশি অজাত শিশুর 'আমরা জন্ম নেব না' ঘোষণার মধ্য দিয়ে শিশুর সুস্থ পৃথিবীর অধিকারলাভের দাবিকে সোচ্চার করেছেন। উল্লেখ্য, এই গল্পে শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর সুবিচারের আশায় উচ্চবিত্তদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার দৃশ্যের সঙ্গে 'জলের মিনার জাগাও' গ্রন্থে উল্লিখিত একটি বর্ণনার কোথাও যেন মিল পাই। লেখক যুবা বয়সের স্মৃতিচারণায় জলপাইগুড়ি বার কোর্টে চা-বাগান শ্রমিকদের বিচারসভার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে-

> "আসামির কাঠগড়ায় ৩৫-জন নারীপুরুষ দাঁড়িয়ে। পুরুষরা খালি গা, মেয়েরা দু একজন বাচ্চাদের বুকের দুধ দিচ্ছে। দু-একজনের পেছনে বুকুনিতে শিশু ঘুমুচ্ছে-মাথাটুকু বাইরে ঝুলিয়ে। ৩৫-জন মদেশিয়া সাঁওতাল নারীপুরুষ, সকলেই কাল, প্রত্যেকের চেহারা আলাদা, কারো কাঁধ একটু নোয়ানো, কোনো মেয়ের মাথাটা একটু হেলানো, কোনো পুরুষ সোজা কাঁধে দাঁড়িয়ে সামনের জাল ধরে, খোপা-বাঁধা কোনো নারীর শঙ্খমুখ জানলার বাইরে তিস্তার চরের বিস্তারে ফেরানো ...এতগুলো কালো চকচকে উদোম শরীর যেন তুচ্ছ করে দিচ্ছিল কোর্টের আদব-কায়দা। ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষের সেই উদাস ভঙ্গি।"[১৪]

এই মৃত্তিকা-সংলগ্ন আদিবাসী ও ভুমিপুত্র, তাঁদের অধিকারের কথা লেখকের কলমে বার বার উঠে এসেছে। পরম স্বস্তি ও তৃপ্তি সহকারে তিনি জানিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই সেই মামলা থেকে রেহাই পেয়েছিল।

সমসাময়িক ঘটনা লেখক-শিল্পী দেবেশ রায়ের লেখার অন্যতম উপাদান। ইতিহাস-ভূগোল-সমাজ-রাষ্ট্র চেতনানির্ভর সেই উপাদান নিখুঁত ও বিশ্বস্ত রূপে নথিকৃত হয়েছে সাম্প্রতিককালে লেখা বেশ কিছু গল্পে। দেশভাগ তথা বঙ্গ বিভাজনের অভিঘাতজনিত মানুষের যে আত্মিক ও অস্তিত্ব সংকট—'উদ্বাস্তু' (১৯৬২০) গল্পে তার বিশ্বস্ত বিবরণ রয়েছে। ঘটনার বিবরণীর মাধ্যমে নথিকরণের ঢঙে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের দম্পতি সত্যব্রত ও অণিমার ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম 'উদ্বাস্তু' গল্পে দেখতে পাই। যার প্রত্যক্ষ কারণ, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশভাগকেন্দ্রিক উস্বাস্তু সমস্যা ও জাতিদাঙ্গার বলি হাজারো গল্প-কাহিনির ভিড়ে এ গল্পের স্বতন্ত্রতা- লেখকের গল্প বলার technique. অনেকটা যেন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, যা গল্পে 'জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত' ও 'বল্লভপুরের থানার বিবরণ'- শীর্ষক অংশে ধৃত।

প্রথমোক্ত অংশে দেখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী 'ভূগোল ও ইতিহাসের যে গুরুতর পরিবর্তন', তার অভিঘাতে অগুনতি মানুষের যে অস্তিত্বের সংকট, তারই সমাধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের হৃত অস্তিত্বকে সন্ধানের প্রয়াস—

> "আমরা এক তথ্যসংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে বিশ্বের পৃথিবীগৃহে বর্তমানে বহু ফেরারি ও বেনামা ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েতনাম-দক্ষিণ ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব জার্মানি-পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলিতে। ...আমরা সমস্ত দেশেই যে যা বলে পরিচিত, সে-তা কিনা, তা পরীক্ষা করছি।"[১৫]

'সে-তা কিনা' ভয়ঙ্কর এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় গল্পের পরবর্তী অংশ 'বল্লভপুর থানার বিবরণ'-এ। এখানে লক্ষণীয়, ঘটনাসমূহকে প্রামাণ্য করার উদ্দেশ্যে গল্পকারের technique. এই প্রয়াসে এখানে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড। রয়েছে বল্লভপুর থানার বিবরণ, বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটের তথ্য-বিবরণ, বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের সংগৃহীত/প্রাপ্ত তথ্য, (অধুনা)পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক এনামুল হক চৌধুরীর স্বতপ্রণোদিত বিবরণ—অণিমাকে 'কুমকুম' নামে এনামুলের রেজিস্ট্রি বিবাহের বয়ান- পূর্ববঙ্গ থেকে এই বঙ্গে আগমনের পর অণিমাকে লেখা

এনামুলের চিঠি- ইত্যাদি নানান তথ্যের উল্লেখে দেশভাগ-উত্তর ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত সত্যব্রত ও অণিমার আত্মপরিচয় স্থাপনের জটিল যুক্তিগত উপস্থাপনা। সমালোচক-প্রাবন্ধিক গল্প নির্মাণের এই কৌশলকে প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "...আত্মপরিচয় হারানোর পেছনে যে জটিল ঘটনাস্রোত প্রবহমান থাকে তার প্রামাণ্য উপস্থাপনা এবং কখনও inductive তথা আরোহী। কখনও abductive বা অবরোহী মোড়ে সওয়াল যুক্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত জতিলতার গ্রন্থিমোচনের কারণেও গল্পের নথির সংযুক্তি অথবা নির্মাণ অনিবার্য ছিল।"[১৬]

তবে 'উদ্বাস্তু' গল্পেই নয়, একথা স্বীকার্য, আঙ্গিক ও কৌশলের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা পরিহার করে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া এবং সাফল্যের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গল্পকার দেবেশ রায়ের স্বাতন্ত্র্য। তাঁর অন্য গল্পগুলিও একথারই সাক্ষ্য দেয়।

> "দেবেশ রায় ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সচেতন লেখক। তাই নথিকরণ তথা ডকুমেন্টেশন তাঁর গল্পে স্বাভাবিক। শিল্পিত ভঙ্গিতে তার প্রকাশ হলেও নথির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।"[১৭]

এই উক্তির প্রামাণ্য দলিল যেন 'মাগুইমারির মাপজোখের অদলবল' (শারদাঞ্জলি/২০১৫) গল্পটি। সাম্প্রতিককালের লেখা গল্প এটি। লেখক দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স-ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী-নেপালী-মদেশিয়া প্রভৃতি জাতি-জনজাতির সঙ্গে যে আত্মিক যাপন করছেন, সেই ভূখণ্ড এবং ভূখণ্ড অন্তর্গত বিশাল জনপদের শিক্ষা, অর্থনীতি ও মানসিকতার বিবর্তনের একটি রেখাচিত্র এই গল্প। অনেকটা যেন প্রতিবেদনের ঢঙে লেখা। লেখক বলেছিলেন—

> "...জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনে বিধৃত প্রকৃতি, রাজবংশীবাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের গাছপালা-জঙ্গল-পশুপাখির এক ভুবনে আমার অধিকার কায়েম হতে শুরু করল, দিনের পর দিন ধরে, বছরের পর বছর ধরে। রাজনীতির অজস্র দৈনন্দিন কাজের আষ্টেপৃষ্টে লিপ্ততা ছাড়া এ অধিকার আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল কারণ এ-কোনও ভ্রমণের অধিকার নয়, এ কোনও দর্শন-শ্রবণের অধিকার নয়, এ এক জনপদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়া, সেই জীবনযাপনের ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে সেঁটে থাকা।"[১৮]

ডুয়ার্সের রাজবংশী জনপদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক লিপ্ততা ও আন্তরিকতা-হেতু সঞ্চিত যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বিংশ শতকে এসে বিশ্বায়নের প্রভাবে সেই জনপদের ক্রমপরিবর্তন এই গল্পে ধরা পড়েছে। গল্পে আরিফ মোহম্মদের ছোটো ছেলে শিক্ষিত জাহির 'আড়াআড়ি' টিভি গ্রামে নিয়ে আসে। আরিফের ছেলেরা এতকাল হাটে ক্ষেতের ফলন বিক্রি বা স-মিলে কাজ করত। সেখানে জাহিরের গ্রামে টিভি নিয়ে এসে নতুন ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা আধুনিকতার সূচক।

> "ওই চৌপত্তি দিয়েই জাহির তার আড়াআড়ি টিভিটা নিয়ে ঝাড়-মাগুইমারিতে ঢুকল ...তারপর তো তাকে একই সঙ্গে ঘাড়ে টিভির বোঝা আর নিজের পায়ের জুতো সামলাতে হয়েছে ...তাই অন্য কোনো কাজের অভাবে সে স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজেও ঢুকল আর কলেজের পড়া শেষ না হতেই টিভির বাক্স কাঁধে বাড়ি ফেরে।"[১৯]

এতদিন নকু সিং-য়ের চৌকো টিভি সাপ্তাহিক হাটবারে 'ভিডিয়ো' দেখবার একমাত্র মাধ্যম ছিল। সেখানে স্থানীয় 'বেটিছোয়া'রা নকু সিংয়ের কাছে ম্যাটিনি শো তে হিন্দি ফিল্মের আবদার করে। 'হামরা ভিডিয়ো হ্যায় অ্যাডাল এডমিকো। লেডিজ নট অ্যালাও।' বলে নকু নাকচ করে দেয়। তবে দুই হাটবারে সাপ্তাহিক শো তে ফরেস্টের ভেতর থেকে, ফরেস্ট আর ভুটানের মাঝখানের চা বাগান থেকে মজুর, কামিন, বাবুরা তাদের পরব অনুযায়ী ট্রাকে করে দুপুরের আগেই এসে পড়ে এবং তাদের জন্য নকুকে ম্যাটিনি শো দিতে হয়, সেখানে নেপালী, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালরা হিন্দি সিনেমা দেখে নাচানাচি করে। আবার জল্পেশে শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসলে রোজই হাটবার, রোজই ম্যাটিনি -'নাগপঞ্চমী', 'নাগিনকুমারী', 'সতীবেহুলা', 'কৈলাসপতি', 'শিবপার্বতী' ইত্যাদি পৌরাণিক সিনেমায় ঝাড়-মাগুইমারি বদল হতে থাকে। তবে নকু সিংয়ের ভিডিয়ো-সিনেমাও প্রাচীন হয়ে পড়ে জাহির 'আড়াআড়ি' টিভি এনে ব্যবসার পরিকল্পনা করলে-

> "...ব্যবসা করিম কিন্তু মাইজান দাদার মতো কেনাবেচার হিসাব রাখিবার পারিম না বা সেইজ্যান দাদার মতো বাড়ি ছাড়ি সাপ্লাইয়ের কাজ পারিম না। কয় ভিডিয়ো দেখাম টিকিট বেইচ্যা নকু সিংয়ের নাখান। কয়, নকু

> সিংয়ের হিন্দি আর বাংলা, মুই ইংলিশ দেখাম-মেমসাহেব, সাহেব। মোর কলেজের মাস্টাররা দেখিবে, ময়নাগুড়িঠে বাবুর ঘর দেখিবার আসিবে।"[২০]

চেনা, অভ্যস্ত আত্মপরিচয়ের পরিবৃত্ত থেকে ছিন্ন মানুষের অস্তিত্বচ্যুতি বা দীর্ঘদিন যাপিত সমাজভূমির ক্রমিক পরিবর্তন এ গল্পে দলিল আকারে নথিভুক্ত। আরিফ মোহম্মদের ছোট ছেলের সিনেমা-ব্যবসায় পদার্পণ, সিনেমা দেখানোর যে বাসনা— 'মুই ইংলিশ দেখাম—মেম সাহেব, সাহেব।' —তা আসলে বিশ্বায়নের প্রভাবে অপ্রতিরোধ্য পালাবদল, লেখক যাকে নিখুঁত দক্ষতায় documentation-এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। দেবেশ রায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়-পর্বত-বন-বাদাড় বেষ্টিত যে জন ও জীবনকে দেখেছিলেন সাংবাদিকের লেন্সে, দ্রুতগামী বিশ্বায়নের যুগে তার পট পরিবর্তন কিভাবে সূচিত হচ্ছে, তারই এক তথ্যনির্ভর সাম্প্রতিক দলিল আলোচিত এই গল্প।

'ঘুমের ভেতর হাইওয়ে' (বর্তমান/২০১৫) অপরাধবোধ - পীড়িত আধুনিক একাকী মানুষের কাহিনী। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে স্ত্রী নয়ন ও শিশুকন্যা মমকে নিয়ে অনীশের আপাত সুখী জীবন। কিন্তু সত্যিই কি সুখী? সাফল্য ও উন্নতির ইঁদুর দৌড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান অনীশ মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফেরে ও মাঝদুপুরে কাজে বেরিয়ে যায়। কন্যা বা স্ত্রীর জন্য সময়হীনতার কারণে সে অপরাধবোধে পীড়িত, অথচ মমকে কয়েক মুহূর্ত বেশি সময় দেওয়ার তাড়নায় রিকশা নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাকে জটিলতায় গ্রাস করে-

> "রিকশা নেবে কি নেবে না। নিলে দশ মিনিট বাঁচে। না নিলে দশ বা পনের টাকা বাঁচে।"[২১] বা, "মেয়ের সঙ্গে ঐ একটু আগে দেখা হওয়ার কস্টিং কি পাঁচ টাকা?"[২২]

আত্মদগ্ধ অনীশ পরিবারকে সুখী জীবন উপহারের তাড়নায় বাড়ি ফিরে সবরকম অপূর্ণতাকে পুষিয়ে দিতে চায়।

> "এই মিনিট বিশ-পঁচিশ অনীশের হাতের একমাত্র প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থা যাতে রাতের ঘুমের ভিতর তার আক্রান্ত হওয়াটা সে পিছিয়ে দিতে পারে। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে অনীশ।"[২৩]

তবে শেষ রক্ষা হয়না- ঘুমের আছন্নতার মধ্যে আশঙ্কায়-দুশ্চিন্তায় সে বিভ্রমে দেখতে পায়, মশারির কাছে যেন নয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু বলবার অপেক্ষায়। মনে হয়, বাথরুমে আলো জ্বেলে কোনো আততায়ী ঢুকে পড়েছে। অথচ বাথরুমে ঢুকে আয়নার দিকে তাকাবার সাহস হয়না। তার ভয়, তাকালে নিজের মুখচ্ছবিই আততায়ীরূপে আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে দেখবে! নিউক্লিয়ার পরিবার-বাসকারী আধুনিক মানুষের উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে নিজ সুখ হননকারী। একদিকে উন্নতি, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা অন্যদিকে নৈতিকতার দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনে কাতর বহুজীবনের কথা অনীশের কাহিনীর অনুষঙ্গে এ গল্পে উঠে এসেছে।

'ইলার দ্বিতীয় গর্ভ' (বর্তমান/২০১৮) গল্পটিও সাম্প্রতিক বাস্তব ঘটনা-আধারিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-চাহিদা, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি এই গল্পে নাগরিক পটভূমে উঠে এসেছে। আজীবন সুস্থ সুন্দর, সাম্য ও শান্তিময় পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন দেবেশ রায়। কিন্তু খুন, ধর্ষণ, হিংসা ইত্যাদি যথেচ্ছ ঘটে চলা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি জীবন সায়াহ্নে পৌঁছানো লেখক দেবেশ রায়কে যে বিচলিত করেছিল, এ গল্প তার প্রমাণ। কাঠুয়া-উন্নাওয়ের বীভৎস খুন ও ধর্ষণের বাস্তব কাহিনী হয়েছে তাই এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়।

বাৎসল্যরস নির্ভর 'ইলার দ্বিতীয় গর্ভ'-এ লেখক দেখিয়েছেন কর্পোরেট জগতের কর্মস্থলে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। শিতি ও ইলার একমাত্র সন্তান ভবা। ভাল নাম 'আসিফা', যা ইলার বহু প্রচেষ্টায় মৌলিক নাম হিসেবে সৌদি আরবের একটি পবিত্র ও বিখ্যাত পর্বতের নাম থেকে গৃহীত। শিতি সংবাদসংস্থায় কর্মরত এবং প্রায় মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফেরে; শিশুকন্যা ভবার সঙ্গে মাঝরাত্তিরেই শুরু হয় মিষ্টি খুনসুঁটি। অন্যদিকে সমসময়ের বীভৎস জান্তব ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়ায় ইলা ভবাকে নিয়ে সদা-আতঙ্কিত। শিতি তাকে আশ্বস্ত করে,

> "একটা আটশো ফুটের ফ্ল্যাটে একটা মাত্র দরজা, তার ওপর কোল্যাপসিবল্। এখান থেকে কি ভবা উধাও হয়ে যাবে নাকি!"[২৪]

তবু ইলার মাতৃসত্তা স্বস্তি পায়না। এক রাতে শিতি সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে কাহিনীর মূল ভাষ্য আকার নেয়। ভবা শিতিকে পেয়ে খুশিতে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইলা এই অসময় বাড়ি ফেরার কারণ জানতে পারে-

> "আমাকে তো কাজে বসতে হবে। সেই জন্যেই তো ফিরেছি। জম্মুর ঐ রেপের ঘটনাটা ফলো-আপ করব। অফিসে পাঠাব। ...আমাদের কাগজ তো এশিয়ার মধ্যে ফার্স্ট, আর আমাদের রাইভাল কাগজের তো সারা ভারতে আটটা এডিশন। তাদের যা রিসোর্স তাতে ঐ মেয়েটির ছবি পেয়ে যাবে। আর আমরা যদি না পাই, তাহলে আমরা তো এশিয়ার মধ্যে সেকেন্ড হয়ে যাব।"[২৫]

গল্পের বক্তব্য লেখক এখানেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও কাহিনী অগ্রসর হয় যখন ইলা মাঝরাত্তিরে ছাদ ফেরত শিতির হাতের খোলা ল্যাপটপের পর্দায় দেখতে পায় তাদের ভবার ছবি। বিস্ফারিত চোখে সে দেখে,

> "ল্যাপটপের পর্দা জুড়ে তাদের ভবার ছবি ...ইলা সেই ছবির দিকে তাকিয়ে নীরব আর্তিতে বিস্ফারিত চোখে নাক ও জলের পর্দা ভেদ করে দেখে সযত্ন-আহরিত ভবার বার্থ সার্টিফিকেটের নামটাই ইংরেজি ক্যাপিটাল হরফে খোদাই করা: আসিফা।"[২৬]

ইলার কষ্ট-শঙ্কা-মমত্ব-মানবিকত্ব নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। যে আসিফার ছবি শিতি হন্যে হয়ে খুঁজছিল সেই আসিফা যেন ইলার চেতনায় কন্যা ভবারই নামান্তর! আসিফা ক্রমে যেন ইলার আপন গর্ভস্থ হতে থাকে। বিপ্রতীপে পিতৃবৎসল হৃদয়ের অন্তরালে শিতির অবক্ষয়িত মূল্যবোধের রাক্ষুসে পিতৃত্বও সংকেতিত হয়। একটি শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল দেশ— এই সত্য ঘটনা অবলম্বনে অধঃপতিত সমাজের নীতিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মূল্যবোধের পতন এই গল্পে চিত্রিত।

এক বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শায়িত জীবন দেবেশ রায়ের লেখকসত্তার মূল। এ কাজে অনুঘটক- সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশলগ্নে সমকালীন বৈশ্বিক-দেশীয় উত্তাল প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও উপনিবেশোত্তর আবহাওয়ায় সমাজেতিহাসের কাঠামো বদল থেকে শুরু করে দেশভাগ-বিদীর্ণ ভিটেহারা মানুষের হাহাকার, আত্মপরায়ণ নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা- সবই তাই একজন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের লেন্সে তাঁর গল্পে ব্যবচ্ছেদপ্রাপ্ত। আর এই ব্যবচ্ছেদে সহায়ক হয়েছে তাঁর প্রখর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশৈলী। দেবেশের গল্প পাঠে এই কারণেই আনকোরা পাঠককে হোঁচটও খেতে হয়। কারণ অভ্যস্ত পাঠভঙ্গি সেখানে বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেবেশ রায়ের গল্পে এককথায় কাহিনি-কাঠামোই অনুপস্থিত। যেখানে রয়েছে, সেখানে গৌণ, প্রচ্ছন্ন। তার স্থলাভিষিক্ত, এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য বা তত্ত্ব। প্রবন্ধে আলোচিত বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা গল্পগুলি ইতিহাস-বদল থেকে ভৌগোলিক পট পরিবর্তন ও গ্রামীণ-নাগরিক মধ্যবিত্তের মন-মানসিকতার ছায়াপাত ধারণ করেছে এই পদ্ধতিতেই– যেগুলি বিষয়ে, আঙ্গিকে, শৈলীতে, স্বতন্ত্রতায় শ্রেষ্ঠ। সদ্যই প্রয়াত হয়েছেন দেবেশ রায়— রেখে গিয়েছেন তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভার। সূক্ষ্ম, বুদ্ধিপ্রধান, তত্ত্বপ্রধান বা এক বিশেষ সময়ের খতিয়ান হিসেবে বাংলা ছোটগল্প ভাণ্ডারে সেগুলি এক একটি রত্ন। তিনি বিশ্বাস করতেন—

> "গল্পই একমাত্র অর্থ তৈরি করতে পারে বলে আর অর্থের ব্যক্তিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নানা অন্বয় থাকে বলে, অনেক দীর্ঘ একটি অতীতকে অতিক্রম করে না এলে ও অনেক পরবর্তী একটি ভবিষ্যৎকে সম্বোধন না করলে, গল্প শিল্প হিসেবে তৈরিও হয়ে উঠতে পারেনা, শিল্প হিসেবে গৃহীতও হয়না।"[২৭]

দেবেশ রায়ের গল্প এই যুক্তিতেই শিল্পসৌকর্যে চিরভাস্বর।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ, ভূমিকা, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩
২. দাশ, কেশবচন্দ্র, 'দেবেশ রায়ের তিস্তা কেন্দ্রিক উপন্যাস : একটি সমীক্ষা', অপ্রকাশিত, ভূমিকা, পৃ. ৩
৩. রায়, প্রকাশ, 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক', অপ্রকাশিত, ভূমিকা, পৃ. ৪৫
৪. রায়, দেবেশ, গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২, পৃ. ৯১
৫. তদেব-পৃ. ৯১
৬. তদেব-পৃ. ৯৩

৭. তদেব-পৃ. ৯৪

৮. তদেব, পৃ. ৯৪

৯. ঘোষ, প্রবীর (সম্পা.), বিশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, দ্বিতীয় অধ্যায়, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৩৬৫, পৃ. ১৮৮

১০. তদেব, পৃ. ১৮৯

১১. একশ বছরের সেরা গল্প, সম্পা. সমরেশ মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪০১, পৃ. ৪১৮

১২. তদেব- পৃ. ৪২০

১৩. তদেব- পৃ. ৪২১

১৪. রায়, দেবেশ, জলের মিনার জাগাও, প্রাচী প্রতীচী, ২০১৬, পৃ. ৫০

১৫. রায়, দেবেশ, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৪৩

১৬. 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প : ভিন্ন ধারার নির্মাণ', শমীক রায়, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা-বিশ শতক, সম্পা. শ্রাবণী পাল, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ৫৯৫

১৭. তদেব, পৃ. ৫৯৫

১৮. রায়, দেবেশ, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৩

১৯. শারদাঞ্জলি-উত্তরবঙ্গ সংবাদ, পূজা সংখ্যা, ১৪২২, পৃ. ১৬৭

২০. তদেব-পৃ. ১৭১

২১. বর্তমান-পূজা সংখ্যা, ১৪২২, পৃ. ৯৫

২২. তদেব-পৃ. ৯৫

২৩. তদেব-পৃ. ৯৬

২৪. বর্তমান-পূজা সংখ্যা, ২০১৮, পৃ. ৫৪

২৫. তদেব, পৃ. ৫৫

২৬. তদেব, পৃ. ৫৬

২৭. রায়, দেবেশ, উপন্যাস নিয়ে, আ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৪২